Vol. 50 | No. 1 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবুল ফজলের ছোটগল্প : জীবনভাবনা

Volume	50
Issue	1
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ মাহবুব হোসেন (মাহবুব বোরহান)
Published online	October 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v50i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i1.3
Pages	৭৯-৯৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আবুল ফজলের ছোটগল্প : জীবনভাবনা

Check for updates

মোঃ মাহবুব হোসেন (মাহবুব বোরহান)*

১

শিল্পীর শিল্প নির্মাণ তার জীবনভাবনারই নান্দনিক প্রকাশ। যে জীবনভাবনা তিনি অর্জন করেন আত্মবিকাশের পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলনির্ভর জ্ঞানানুশীলনের অব্যাহত প্রয়াসের মাধ্যমে। দেশ-কাল পরিবর্তনের সঙ্গে যা সর্বদা পরিবর্তনশীল। শিল্পীর দেশ-কালের পরিবর্তন ঘটলে অনিবার্যভাবে পরিবর্তন ঘটে তাঁর জীবনভাবনার। শিল্পকে বুঝতে হলে অবিকল্প শর্তেই বুঝতে হয় শিল্পীকে, তাঁর মানসচৈতন্যের স্বরূপকে। সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। সাহিত্যিকের জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির তাৎপর্য উপলব্ধি তাঁর সাহিত্য বিচারের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)-এর ছোটগল্প সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনার অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবেই প্রয়োজন দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে তাঁর পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলকে উপলব্ধি করা। কারণ "ছোটগল্প-কারের উপলব্ধির আশ্রয় তাঁর পরিচিত বস্তুময় জীবন-ভূমি।" (ভূদেব, ১৯৮৯ : ২৫)

২

আবুল ফজল ১৯০৩ সালের ১ জুলাই চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত কেঁওচিয়া গ্রামে এক নিম্নমধ্যবিত্ত ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৌলভী ফজলুর রহমান চট্টগ্রাম থেকে উলা পাস করে কিছু দিন শিক্ষকতার পর আমৃত্যু চট্টগ্রামের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জুমা মসজিদে ইমামতি করেন। পিতামহ মৌলভী হায়দার আলী। আবুল ফজলের পিতা, পিতামহ ছিলেন রীতিমতো পাস করা আলেম। (আবুল ফজল, ২০০৬ : ৩৫) মা গুলশান আরা ছিলেন অভিজাত পরিবারের কন্যা। আর্থিকভাবে দরিদ্র হলেও আবুল ফজলের পরিবার শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল উন্নত এবং সামাজিকভাবে সম্মানিত। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এ পরিবারের সকল কর্মকাণ্ডই নিয়ন্ত্রিত হত ইসলাম এবং ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি রেওয়াজ ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। এ কারণে বাঙালি মুসলমান হয়েও বাংলা ভাষা পরিবারটির কাছে তেমন শ্রদ্ধা, সমীহ বা আগ্রহের বিষয় ছিল না, যতটা ছিল আরবি, ফারসি, উর্দু প্রভৃতি ভাষা। তবে পরিবারের কথোপকথনের ভাষা ছিল বাংলাই। অতি খান্দানি মুসলিম পরিবারের মতো সেখানে যদিও উর্দুর প্রচলন ছিল না, তবুও বাংলা ভাষায় আবুল ফজলের লেখা প্রকাশিত হয়েছে জেনে তাঁর বাবা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন। পিতা তাঁকে উপদেশ দেন, "লিখতেই যদি চাও আরবি-ফারসিতে না পারো উর্দুতে

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

লিখতে চেষ্টা কর।" (আবুল ফজল, ২০০৬: ১৫) এ রকম ধর্মীয় গোঁড়ামির মধ্যেই আবুল ফজলের শৈশব-কৈশোর অতিক্রান্ত হয়। তিনি ১৯২৩ সালে নিউস্কিম মাদ্রাসা থেকে প্রবেশিকা পাস করেন। ১৯২৫ সালে আবুল ফজল ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাস করার পর ১৯২৯ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিটি পাস করেন। স্নাতক শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সামাজ'-এর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে সংযুক্ত হন। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৪০ সালে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। কাজেম আলী স্কুলে সাময়িক শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনের শুরু। তারপর কিছু দিন সীতাকুণ্ড নিউস্কিম মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তী সময়ে আবুল ফজল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আবুল ফজলের লেখালেখির শুরু কলেজজীবন থেকেই। বাংলা ভাষায় তাঁর সাহিত্যচর্চা ছিল, বলা যায়, প্রবল প্রতিকূল স্রোতের উজানে নৌকা চালানোর মতোই এক দুঃসাহসিক অভিযান। ১৯১৪-১৯১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৩৯-১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৭এর দেশভাগ, ইংরেজ শাসনের অবসান, ১৯৫২এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১এর স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ১৯৭৫এর মর্মান্তিক আগস্ট ট্রাজেডি আবুল ফজলের মননে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। দেশীয় অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনসহ নানা রকম আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন আবুল ফজল। কখনো কখনো এসবে করেছেন সক্রিয় অংশগ্রহণ। (আবুল ফজল, ২০০৬ : ১৯) আবুল ফজলের ভাষায়, "আমাদের এ কালটা কেটেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝড় ঝাপটার মধ্যে।"(আবুল ফজল, ২০০৬ : ৭০) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ স্বকাল আবুল ফজলকে গড়ে তুলেছে প্রখর সমাজসচেতন এবং সংবেদনশীল জীবনজিজ্ঞাসু মানুষ হিসেবে; যা তাঁর লেখকজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পারিবারিক ধর্মীয় গোঁড়ামির মধ্যে মানুষ হলেও আবুল ফজলের মধ্যে কোনো রকম ধর্মীয় কুসংস্কার দানা বাঁধতে পারে নি। এমন কি প্রথাগত আচারনিষ্ঠ ধর্মচর্চাও তাঁর মধ্যে তেমন লক্ষ করা যায় না। শৈশব থেকেই এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত। কৈশোর-জীবনে দারুণ ডানপিটে আবুল ফজল লিখেছেন, "...আমি কখনো ভালো ছাত্র ছিলাম না— প্রচলিত অর্থে ধার্মিকও আমি নই।" (আবুল ফজল, ২০০৬ : ৬২) নিষ্ঠাবান ধার্মিক হয়েও আবুল ফজলের পিতাও অনেক কুসংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন। পরিণত বয়সে নিজেকে মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তা হিসেবে গড়ে তোলার পিছনে তাঁর শৈশবলালিত যুক্তিবাদী মানসিকতা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রবর্তিত 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'-এর চেতনা আবুল ফজলের যুক্তিনিষ্ঠ জীবনবাদী মনোভঙ্গি নির্মাণে সবচেয়ে গভীর এবং স্থায়ী ভূমিকা পালন করেছে।

সাহিত্যমনা বন্ধুবান্ধবদের সান্নিধ্য এবং কঠোর পাঠাভ্যাস আবুল ফজলের সৃজনশীল সত্তাকে করেছে উজ্জীবিত। কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কাজী নজরুল ইসলাম

(১৮৯৯-১৯৭৬) এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর সান্নিধ্য তাঁর সাহিত্য সৃজনের স্পৃহা ও উৎসাহকে ত্বরান্বিত করেছে। যুক্তিনিষ্ঠ মানবতাবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে খ্যাত হলেও আবুল ফজলের সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পরিমাণও কম নয়। প্রখর সমাজসচেতন সাহিত্যসাধক হিসেবে তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে মুখ্যত বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও পশ্চাৎপদতাসহ নানা রকম অসংগতিকে তুলে ধরেছেন, তৎপর হয়েছেন সেগুলো থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধানে। আবুল ফজল নিপুণ তীরন্দাজের মতো সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং কূপমুণ্ডকতাকে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে আঘাত করেছেন; জাগিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন মানুষের অপসৃয়মান বিবেককে।

কোনো মানুষই দোষ-গুণের ঊর্ধ্বে নয়। নানামুখী গুণের আকর মহৎ মানুষের জীবনেও অনেক সময় অনেক রকম সীমাবদ্ধতার সন্ধান মেলে। আবুল ফজলও হয়ত এর ব্যতিক্রম নন। তাই তো এক সময়ের বাংলার বিবেক হিসেবে কথিত আবুল ফজলের মধ্যেও সমালোচক লক্ষ করেন সমালোচনার উপাদান আবুল কাসেম ফজলুল হক লিখেছেন:

> ...মহৎ লেখকেরা রাজভয় ও লোকভয় অগ্রাহ্য করে আপন অন্তরের তাগিদে প্রয়োজন হলে একলা চলার দুঃসাহস নিয়ে যেভাবে অগ্রসর হন এবং সমকালে নিন্দিত হয়েও উত্তরকালে নন্দিত হন, তেমন ভূমিকার পরিচয় তাঁর রচনায় লক্ষ করা যায় না। (আবুল কাসেম , ২০০২ : ২৬২)

তবে সাহিত্যসাধক আবুল ফজল বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, নাটক, আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বিশেষ করে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতা, রক্ষণশীলতা এবং সীমাবদ্ধতাকে যেরূপ নিবিড়ভাবে চিত্রিত করেছেন তার জন্য পাঠক দীর্ঘকাল তাঁকে মনে রাখবে। ছোটগল্পকার হিসেবে আবুল ফজলের বিশেষত্ব বিচার আমাদের এ পর্যায়ের আলোচ্য অনুষঙ্গ।

৩

আবুল ফজলের ছোটগল্প রচনার কালপরিসর প্রায় চার দশক। ১৩৩০ সালের 'কল্লোল' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় সর্বপ্রথম আবুল ফজলের 'একটি আরবী গল্প' প্রকাশিত হয়। এটি ছিল খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আরবি সাহিত্যিক হারিরির একটি মকামার অনুবাদ। তাঁর দ্বিতীয় গল্প একটি ইংরেজি গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত 'জামাই'। গল্পটি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের 'বৈভব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (আনোয়ার পাশা, ১৯৮১ : ২৯৩) তাঁর প্রথম মৌলিক ছোটগল্প 'জয়' ১৩৩৪ সালের কার্তিক মাসে 'সওগাত' পত্রিকায় 'ইসলাম কি জয়' নামে প্রকাশিত হয়। (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ৫৭০) পত্রিকায় প্রকাশিত শেষ ছোটগল্প 'ইতিহাসের কণ্ঠস্বর' 'সমকাল' পত্রিকায় ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ৫৭২) আবুল ফজলের ছোটগল্পগ্রন্থ মোট পাঁচটি। এগুলো হলো : *মাটির পৃথিবী*

(১৯৪০), *আয়ষা* (১৯৫১), *শ্রেষ্ঠগল্প* (১৯৬৪), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৭৮) এবং *মৃতের আত্মহত্যা* (১৯৭৮)। তাঁর রচিত ছোটগল্প সংখ্যায় অনেক বেশি না হলেও জীবনভাবনা ও শিল্পসুষমায় বিশেষ গুরুত্ববহ।

আবুল ফজল এমন একটি সময়ে গল্প রচনা শুরু করেন যখন বাংলা ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পার হয়ে তিরিশোত্তর কল্লোলীয় আধুনিকতার নতুন বাঁকে এসে উপনীত হয়েছে। ভূদেব চৌধুরী যাকে 'বাংলা ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্ব' বলে উল্লেখ করেছেন যার আরেক নাম 'রবীন্দ্রোত্তর যুগ'। এ যুগ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> যেমন কবিতায়, তেমনি বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসেও এ-কাল 'রবীন্দ্রোত্তর যুগ' নামে অভিহিত। রবীন্দ্র-উত্তরণের প্রয়াস বাংলা গল্পে সেদিন সফল হয়েছিল কি না, সে তর্ক বর্তমান উপলক্ষে অপরিহার্য নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে উত্তীর্ণ হতেই হবে— এই প্রবল উৎসাহে সে কালের একদল তরুণ সাহিত্যিক জোট বেঁধেছিলেন; তাঁদের সে সমবেত প্রয়াস ইতিহাসের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রধানত 'কল্লোল' (১৩৩০-১৩৩৬ সাল), 'কালিকলম' (প্রথম প্রকাশ, ১৩৩৩ সাল) এবং 'প্রগতি' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৪ সাল) নামক তিনটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই জুটির সাহিত্যিক যুগান্তর সাধনের চেষ্টা রহিরঙ্গ রূপ ধরেছিল। সেই সঙ্গে আরো ছিল 'উত্তরা', 'ধূপছায়া','আত্মশক্তি' ইত্যাদি। এদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী পত্রিকা 'কল্লোল'-এর নাম অনুসারে এ-কালের জনপ্রিয় নাম বাংলা সাহিত্যের 'কল্লোল যুগ'। (ভূদেব, ১৯৮৯ : ৩০০)

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), মনীশ ঘটক (১৯০১-১৯৭৯), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৫), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) প্রমুখ 'কল্লোল যুগ'-এর গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্পকার । কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)ও যে মূলত এই সময় এবং এই ধারারই ছোটগল্পকার তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত গল্পসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে তা উপলব্ধি করা যায়।

বাঙালি মুসলমান তার সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার জন্য কল্লোল যুগীয় সাহিত্য ধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে নি। এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদ যথার্থই বলেছেন :

> উন্নত শিক্ষা উনিশ ও বিশ শতকে বাঙালি হিন্দু কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকারদের যেমন উন্নত সাহিত্য সৃষ্টিতে সমর্থ করেছিলো, সে-উন্নত শিক্ষা বাঙালি মুসলমান লেখকেরা বিশশতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পান নি; তাই তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য প্রধানত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার প্রকাশ। বিশশতকের তৃতীয় দশকে যে-আধুনিকতা দেখা দেয় বাঙলা সাহিত্যে, বাঙালি মুসলমানেরা শিক্ষাগত কারণে তার থেকে দূরে থেকে যান। মুসলমান লেখকদের সামাজিক অবস্থান, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সমকালীন রাজনীতি তাঁদের আধুনিকতা আয়ত্ত করা থেকে বিরত রাখে। (হুমায়ুন, ১৯৯০ : ১)

তাই তিরিশোত্তর আধুনিক যুগের লেখক হওয়া সত্ত্বেও আবুল ফজল ভৌগোলিক এবং আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতার জন্য উপর্যুক্ত কল্লোলীয় আধুনিকতাকে পুরোপুরি আত্মস্থ করতে না পারলেও তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। বাংলা ছোটগল্পের এই নতুন যুগের হাওয়া নানাভাবে আবুল ফজলকেও স্পর্শ করেছিল। 'কল্লোল যুগে'র হাওয়ার সঙ্গে ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ আবুল ফজলের

সৃষ্টিশীল মননে এক নব উন্মাদনার সঞ্চার করেছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি *সপ্তপর্ণা* (১৯৬৪) গ্রন্থের লেখকের কথায় যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে তাঁর লেখকজীবনের হয়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়ের একটি স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

> ত্রিশের অতি-আধুনিক সাহিত্যান্দোলনের সময় আমাদের লেখক জীবনের সবে শুরুমাত্র। তখনো আমরা পাঠকের খোলস ছেড়ে লেখকের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিনি। ফলে ঐ আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটেনি বটে কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে পাঠক-মনের বাতায়ন-পথে তার হাওয়া এসে যে আমাদের মনের গায়েও লেখেছে (লেগেছে) ও দিয়েছে ধাক্কা তাতে সন্দেহ নেই। (স্মরণীয় : এ গ্রন্থের অনুবাদ 'একটি আরবী গল্প' কল্লোলেই প্রথম ছাপা হয়েছিল।)
>
> এ সংগ্রহের কোনো কোনো লেখার তীর্যক ও বেপরোয়া ভঙ্গি যে হাওয়া লাগা ধাক্কা খাওয়া মনেরই দিকচিহ্ন। সে ঊনপঞ্চাশী হাওয়ার সঙ্গে এসে জুটেছিল সে দিনের ঢাকা মুসলিম সমাজের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ। মনের দোল-খাওয়া বেপরোয়া অবস্থায় আমরা যা তা লিখেছি, সেদিনের সম্পাদক ও পাঠকের কাছে হয়ত প্রশ্রয়ও পেয়েছিল এভাবে যা তা লেখার। (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ৫৬৪-৫৬৫)

ত্রিশের সাহিত্যান্দোলন সম্পর্কে আবুল ফজলের ছিল একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব বিবেচনা, যা তিনি তাঁর 'আধুনিক মন : আধুনিক সাহিত্য' প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের সাহিত্যান্দোলন নামে পরিচিত শিল্প-সচেতনতার যে একটা ঢেউ উঠেছিল যার তরঙ্গাঘাত পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে এসে পৌঁছেছে অনেক পরে– বিভাগোত্তর কালেই, সে আন্দোলন বা ঢেউয়ের মৌল ত্রুটি বা কৃত্রিমতা সম্বন্ধে সজাগ না হলে ওখানে তার যে শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে আমরাও তার হাত থেকে রেহাই পাব না। সাহিত্যের যে মৌল উৎস নিজের মন ও পরিবেশ বা উভয়ের সংগতি সাধন, অতি উৎসাহ বা সাহিত্যে 'নবত্ব' আনয়নের মোহে ওখানকার শিল্পীরা তা আমলেই আনেননি সেদিন; ফলে তাঁদের অধিকাংশ রচনাই হয়ে পড়েছে 'কৃত্রিম' আর 'ভুঁইফোড়'। (আবুল ফজল, ২০০৫ : ১৭)

'কল্লোল যুগে'র ঢেউ এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের যৌক্তিক শৃঙ্খলা ও বিজ্ঞানমনস্কতাই আবুল ফজলের ছোটগল্পকে করেছে অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষণ প্রবণতার পাশাপাশি সুতীব্র জীবনবাদী ও সমাজজিজ্ঞাসু। আবুল ফজলের ছোটগল্প তাঁর জীবনভাবনারই রূপালেখ্য। অন্যভাবে বলা যায়, শিল্পরূপাভাসের অন্তরালে তিনি ছোটগল্পে তাঁর জীবনভাবনারই রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য, তাঁর ছোটগল্পে বিধৃত জীবনভাবনার স্বরূপ বিচার।

৪

উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণ বাঙালির ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। যদিও গ্রামবাংলার অগণিত অশিক্ষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এই জাগরণের কোনো সংস্রবই ঘটে নি, তবুও বাঙালির মোহমুক্তি ও অগ্রযাত্রায় এটিই ছিল প্রথম মাইলফলক। রাখালচন্দ্র নাথের ভাষায় :

> উনিশ শতকে বাঙালী মন হঠাৎ জেগে উঠেছিল এবং সকল বিরোধ-সংঘর্ষ ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই জাগরণ যে পরিণামের অভিমুখী হয়েছে, সে পরিণাম — জাতির আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা, এক নতুন জাতীয়তাবোধ। ইংরেজ-শাসন ও তদধিক ইংরেজি শিক্ষা আঘাত হেনেছে বাঙালীর ভাব-জীবন ও চিন্তাজীবনের মূলে, তাঁর আত্মতৃপ্তির মানসদুর্গে। আঘাত হেনেছে আচারসর্বস্ব, পুঞ্জীভূত অনাচার, অজস্র বিধিনিষেধের আকর ধর্মে এবং নাড়া দিয়েছে প্রথাজীর্ণ, অবসাদগ্রস্ত, হাজারো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙালী সমাজকে। সেই আঘাত ভেঙেছে অবসাদ, আঘাতে অচল হয়েছে সচল এবং গতানুগতিক পেয়েছে নবরূপ; ঘটেছে জাগরণ— বাঙালীর প্রাণ, মন ও আত্মার সুপ্তিভঙ্গ। (রাখালচন্দ্র, ১৯৮৮ : মুখবন্ধ ৭-৮)

কিন্তু এই 'আত্মার সুপ্তিভঙ্গ' বা 'জাগরণে' বাঙালি মুসলমানের কোনো রকম সংশ্লিষ্টতা ছিল না; এর কোনো রকম ঢেউ স্পর্শ করে নি বাঙালি মুসলমানকে। কারণ "বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্তরা শুধু বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিত্তই নয়, অবাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্তদের তুলনায়ও অনেক অনগ্রসর এবং দেরীতে যাত্রা শুরু করেছেন।" (আকাশ, ১৯৯০ : ১৫) বাঙালি মুসলমানের 'আত্মার সুপ্তিভঙ্গ' ঘটে অনেক পরে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায় :

> পার্টিশনের পর পূর্ব বাংলা — এখন তো বাংলাদেশ — নতুন করে জেগে ওঠে। সেখানে দেখা দেয় দ্বিতীয় এক রেনেসাঁস। প্রথম রেনেসাঁসে নায়কদের মধ্যে ইউরোপীয় ছিলেন, খ্রীস্টান ছিলেন, কিন্তু মুসলমান ছিলেন না। দ্বিতীয় রেনেসাঁসের নায়করা প্রায় সকলেই মুসলমান। এবার তাঁরা পা মিলিয়ে নিচ্ছেন। প্রথম রেনেসাঁস ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় রেনেসাঁস হচ্ছে ঢাকাকেন্দ্রিক। (অন্নদাশঙ্কর, ১৯৯১ : ৬)

এই দ্বিতীয় রেনেসাঁসেরই মানসপুত্র আবুল ফজল।

আবুল ফজল তাঁর ছোটগল্পে যে জীবনের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন সে জীবন ভৌগোলিকভাবে অবিভক্ত ভারতের পূর্ববাংলা, ১৯৪৭ এর দেশ-ভাগ পরবর্তী পূর্বপাকিস্তান এবং ১৯৭১ এর স্বাধীনতা-পরবর্তী সার্বভৌম বাংলাদেশের কৃষি অধ্যুষিত বাঙালি মুসলমানের জীবন। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে সত্তর-এর দশক পর্যন্ত যার বিস্তার। সামাজিকভাবে সে-জীবনে শিল্পনির্ভর নগর সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটলেও কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সংস্কৃতিই সে-জীবনের মূল চালিকাশক্তি। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বাঙালি মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করেই আবুল ফজলের জীবনভাবনা পল্লবিত হয়েছে। ছোটগল্পে তিনি মূলত বনেদি, সাধারণ এবং অবহেলিত-অন্ত্যজ সকল শ্রেণির বাঙালি মুসলমানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতকে চিত্রায়িত করেছেন, যার মধ্য থেকে সহজেই আবুল ফজলের জীবনভাবনার স্বরূপকে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর ছোটগল্পে একদিকে যেমন রূপায়িত হয়েছে উচ্চবিত্ত বনেদি মুসলমানের ভোগসর্বস্ব ক্ষয়িষ্ণু তামস জীবনের ছবি, অন্য দিকে তেমনি অঙ্কিত হয়েছে বিত্তহীন অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর করুণ চিত্র। আবুল ফজল তুলে ধরেছেন বাঙালি মুসলমানের মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাতে উদ্বেলিত প্রেমময় জীবনকে। চিত্রায়িত করেছেন অতি আধুনিকদের যন্ত্রণাকাতর অস্থির জীবনের পাশাপাশি অসুস্থ রাজনীতির অশান্ত অভিঘাতে বিপন্ন জীবনবাস্তবতাকে। অনগ্রসর বাঙালি মুসলমানের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতশ্রী অবস্থায় তিনি ছিলেন প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত ও মর্মাহত। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজল লিখেছেন :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত তরুণ ইংরেজ কবি এ্যালান লুইস এ দেশের সমাজ জীবন দেশে (দেখে) মন্তব্য করেছিলেন : 'এ দেশে পরিণতি তথা মানসিক পরিপূর্ণতা অর্জন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। মানুষের পরিবেশ দেখে ক্রুদ্ধ হওয়ার মতো এতো বস্তু এখানে রয়েছে যে সংযত-মনা হওয়া সম্ভবই নয়। সমাজের চেহারার (চেহারায়) দিশেহারা হওয়ার মতো বস্তু অনেক...।'

অবিভক্ত ভারতে চারদিকে মানুষ আর সমাজের হতশ্রী চেহারা দেখেই লুইসের এ মন্তব্য। সমাজ হিসেবে তখন বাঙালি মুসলমান ছিল আরো দীন আরো হতশ্রী, ভুগছিল জীবনের নানা ক্লেদ আর গ্লানিতে। তাই আমাদের পক্ষে, বিশেষ করে শিল্পীসত্তায় কোথাও স্বস্তি পাওয়ার উপায় ছিল না। সব কিছুই যেন আমাদের খোঁচা দিত, করত provoke — না চটে মনকে শান্ত রাখার উপায়ই ছিল না। (আবুল ফজল, ২০০৬ : ৭)

তিনি মনে প্রাণে চাইতেন একটি বিকশিত ও উন্নত জাতি হিসেবে বাঙালি মুসলমানের বিকাশ ঘটুক। এই চেতনা থেকেই তিনি বাঙালি মুসলমানের হতশ্রী জীবনবাস্তবতার নিরাভরণ ছবি তুলে ধরে সকলের কাছে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন সেই জীবনের সমূহ সীমাবদ্ধতাকে; নিপুণ তীরন্দাজের মতো নানা রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আঘাত করেছেন এই সমাজকে যাতে বাঙালি মুসলমান একদিন এই সকল সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে একটি শিক্ষিত, কুসংস্কারমুক্ত উন্নত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

৫

আবুল ফজল লিখেছেন, "মানুষের বিচিত্র জীবন, তার সুখ-দুঃখ, তার হাসি-অশ্রু আমাকে নাড়া দিয়েছে, আমার মনে তুলেছে ঝড় — এই ঝড়কে ধরতে চেয়েছি মনে ও কলমে।" (আবুল ফজল, ২০০৫ : ৪৪) তিনি তাঁর ছোটগল্পে মানুষের বিচিত্র জীবন ও তার আনন্দ-বেদনাকে রূপায়িত করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই সাধারণভাবে গ্রাম-শহর নির্বিশেষে পূর্ববাংলার সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই ধারার উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলো হলো : 'মাটির পৃথিবী', 'মা', 'জয়', 'চোর', 'হাকিম','একখানি হাসি','আক্কেল গুড়ুম'।

'মাটির পৃথিবী' (১৩৪৩) গল্পটি 'সওগাত' পত্রিকায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। অশিক্ষিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট কলহ-আকীর্ণ অনগ্রসর গ্রামীণ জীবনের গল্প এটি। পরিবারে নিজেদের মধ্যে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে অতি সামান্য কারণে ঝগড়া-বিবাদ, মনোমালিন্য এই জীবনের সাধারণ অনুষঙ্গ। ঝগড়া-ঝাঁটিই এখানে ব্যক্তিত্ব ফলানোর একমাত্র অবলম্বন। লেখকের ভাষায় : "ঝগড়া চেঁচামেচি ও মারধর এ যেন এদের দৈনন্দিন জীবনের খোরাক। স্বামীর স্বামীত্ব, মায়ের মাতৃত্ব ও শাশুড়ীর শাশুড়ীত্বের এসব হলো একমাত্র উপজীবিকা।" (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ৫) গল্পে তজু, তজুর মা এবং তজুর স্ত্রী খাতুনের মধ্যে সব সময় ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই আছে। প্রতিবেশী ছলিমনের মা'র সঙ্গেও তাদের চিরশত্রুতা। তারপরও এই জীবনে আনন্দ উৎসব সহমর্মিতা আছে। আছে বিভেদ উত্তরণের অনাবিল প্রশান্তি। গল্পে দেখা যায়, দুগ্ধপোষ্য সন্তান রেখে ছলিমন মারা যাওয়ার পর তার ক্ষুধার্ত সন্তানের নিরন্তর কান্নার শব্দে তজুর স্ত্রী খাতুনের মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং শত্রুতা ভুলে সে রাতের আঁধারে গোপনে চুপি চুপি ছলিমনের সন্তানকে নিজের স্তন্য পান করিয়ে

আসে। অবশেষে ঈদের দিনে পুণ্য ক্ষণে তজুর স্ত্রী নিজে গিয়ে শত্রুতা ভুলে ছলিমনের মাকে চাচি বলে সম্বোধন করে তার আঙিনায় গিয়ে দাঁড়ায়। ছলিমনের মাও তাকে সাদরে গ্রহণ করে। খাতুন ছলিমনের মাকে পায়ে হাত দিয়ে ঈদের সালাম জানিয়ে ছলিমনের মাতৃহীন
সন্তানটিকে কোলে তুলে দুধ খাওয়াতে থাকে। তখন "খাতুনের মনে হল, তার এক মাসের রোজা রাখা এবার সার্থক হল, তার ঈদের আনন্দও যেন ততক্ষণেই পূর্ণ হল।" (অবুল ফজল, ১৯৯৫ : ২১)

সকল দুঃখ-দুর্দশা ও সংকটের মধ্যেও মৃত্তিকাসংলগ্ন দোষে-গুণে ভরা শাশ্বত মাতৃহৃদয় যে পল্লিজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং পল্লিজীবন যে মাটির মতোই সর্বংসহা এই সত্যই লেখক গল্পটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'জয়' (১৩৩৪) লেখকের প্রথম মৌলিক ছোটগল্প। গল্পটিতে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে আবুল ফজল মুসলমানদের শিয়া-সুন্নি বিভেদকে চিত্রিত করেছেন। গল্পে মুখে সকল মুসলমান ভাই ভাই বলে মঞ্চে বক্তৃতা দিলেও এক সুন্নি মাওলানা সামাজিকভাবে শিয়া পিতার কন্যার সাথে ছেলের বিয়ে না দিয়ে শূন্য পালকি নিয়েই ছেলেসহ বিয়ের আসর থেকে চলে আসেন। এখানে শেষ পর্যন্ত প্রথাগত সুন্নী মৌলানার জয় হলেও আসলে প্রচণ্ডভাবে পরাজিত হয়েছে মানবিকতা। 'মা' (১৩৩৫) গল্পের নাম প্রথমে ছিল 'আয়ষা', পরে নাম পরিবর্তন করা হয়। গল্পটিতে লেখক অন্তঃসারশূন্য আভিজাত্য এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় আন্তঃপারিবারিক অসুস্থ প্রতিযোগিতাকে তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ জীবনের বংশানুক্রমিক এই অসুস্থ প্রতিযোগিতাময় শত্রুতা যে কত ভয়াবহ রকম নির্মম ও ন্যাক্কারজনক হতে পারে তার বাস্তব চিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে গল্পটিতে লেখক ধর্মকে নিজ স্বার্থানুযায়ী ব্যবহারের চাতুর্যকেও স্পষ্ট করেছেন। 'চোর' (১৩৩৬) লেখকের ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বি.টি পড়ার সময় বাংলা ক্লাসের 'টিউটোরিয়াল ওয়র্ক' হিসেবে রচিত একটি গল্প। পরে মাসিক 'মোহাম্মদী'তে ছাপা হয়। (আবুল ফজল, ২০০৬ : ১৩৬) ভূমি নিয়ে বিরোধ বাঙালির গ্রামীণ সামাজিক জীবনের এক চিরায়ত বাস্তবতা। 'চোর' গল্পে লেখক ভূমি বিরোধে জড়িয়ে পড়া দুটি পরিবারের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কেন্দ্র করে গ্রামের সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনবাস্তবতাকে রূপ দিয়েছেন। যে বাস্তবতায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে শৃঙ্খলিত বদ্ধ জীবনযাপনই নারীর অমোঘ নিয়তি । গল্পে মজিদের মেয়ে মেহের-এর দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে লেখক জানাচ্ছেন :

> এই বাড়ীর চতুর্সীমার বাহিরে যাইবার তাহার অধিকার নাই। এই নির্দিষ্ট সীমানার ভিতর মেহের তাহার দাদীমাকে জীবন কাটাইয়া যাইতে দেখিয়াছে, তাহার মাকে জীবন কাটাইতে দেখিয়াছে। আর তাহার জীবন? — কে জানে কোথায় কাটে, তাহার চিরপরিচিত জনের চোখের অন্তরালে, কোন অন্ধকার অন্তঃপুরে? (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ১১২)

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পাপ বাঙালির মনে যে হীনম্মন্যতার বিষবৃক্ষ রোপণ করে দেয় তারই চিত্র প্রকাশিত হয়েছে 'হাকিম' (১৩৪০) গল্পে। এতে রূপায়িত হয়েছে সাধ্যের সর্বস্ব উৎসর্গ করে সন্তানকে হাকিম বানানোর প্রাণান্ত প্রচেষ্টার কাহিনি। একই সঙ্গে লেখক

গল্পটিতে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক বৈষম্য বিশেষভাবে শিক্ষার প্রতি বাঙালি মুসলমানের অনাগ্রহকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'একখানি হাসি' (১৩৩৯) গল্পে বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিক্ষকজীবনের দুর্দশা চিত্রায়িত হয়েছে। 'আক্কেল গুড়ুম' (১৯৬৭) গল্পে রূপায়িত হয়েছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত গ্রামবাসীর পিরবাদে আস্থাশীল জীবনবাস্তবতা।

আবুল ফজল ছোটগল্পে সমাজজীবনের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তার মধ্য দিয়ে লেখকের যুক্তিবাদী প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালি মুসলমানের বিদ্যমান সামাজিক সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে তিনি এগুলো থেকে সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, স্বপ্ন দেখেছেন একটি উন্নত সমাজ নির্মাণের। *মাটির পৃথিবী* গল্পগ্রন্থটি সম্পর্কে আবুল ফজল লিখেছেন :

> এককালে একটা গল্পের বই প্রকাশ করেছিলাম – মাটির পৃথিবী নাম দিয়ে। অর্থাৎ দোষে-গুণে ভরা মাটির মানুষেরই জীবনের কিছুটা পরিচয় এ গল্পগুলিতে ছিল। তাতেও কাঁটা ছিল অনেক — সমাজের গায়ে নিষ্করুণ হাতেই এ কাঁটার খোঁচা দিয়েছি আমি বারংবার। (আবুল ফজল, ২০০৫ : ৪৪)

সমাজকে বদলে দেয়ার প্রত্যয় নিয়েই তিনি বিদ্যমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজকে নির্মম হাতে বার বার আঘাত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, "সন্দেহ নেই আঘাতের পর আঘাত করে আমার পাঠকের মনকে সংস্কার-মুক্ত করতে চেয়েছি।" (আবুল ফজল, ১৯৮১ : ৭) স্পষ্ট যে, আর্থ-সামাজিক জীবনভাবনায় আবুল ফজল ছিলেন রূপান্তরবাদী।

আবুল ফজল তাঁর কিছু ছোটগল্পে বনেদি মুসলমানের ভোগসর্বস্ব ক্ষয়িষ্ণু ও তমসাচ্ছন্ন জীবনকে রূপায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 'শরীফ', 'পরিণাম', 'জনক', 'সিতারা' এবং 'বিবর্তন' গল্পের নাম উল্লেখ করা যায়।

বনেদি মুসলমানের কৌলীন্য আর পর্দা প্রথার নির্মম শিকার এক সন্তান-সম্ভবা নারীর করুণ কাহিনি বিবৃত হয়েছে 'শরীফ' (১৩৩৬) গল্প। লেখক গল্পটিতে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের শিক্ষায় অনাগ্রহ, বাল্যবিবাহ এবং অবরোধবাসিনী নারীর দুর্দশাসহ জীবনের যাবতীয় ক্লেদকে তুলে ধরেছেন। গল্পটির পরিণতিতে কৌলীন্য ও পর্দা রক্ষা করে রাতের অন্ধকারে বোরকাবৃত হয়ে পথ চলতে গিয়ে মোটরগাড়ি চাপা পড়ে জীবন বিসর্জনের নির্মম দৃশ্য আমাদের বেগম রোকেয়ার *অবরোধ বাসিনী* গ্রন্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'পরিণাম' (১৩৩৫) গল্পে গল্পকার বনেদি সম্ভ্রান্ত মুসলমান নবাবের বহুগামী ভোগাসক্ত জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'জনক' (১৩৩৪) গল্পে চিত্রায়িত হয়েছে বনেদি মুসলমানের যৌন অনাচারময় তমসাচ্ছন্ন ভণ্ড এবং প্রতারক জীবন। গল্পে দেখা যায় বড় ব্যবসায়ী ও জমিদার নিষ্ঠাবান ধার্মিক সৈয়দ আবদুল আলীম চৌধুরীর যৌন অনাচার এবং প্রতারণার শিকার তারই অধীনস্থ বিধবা অসহায় প্রজা ফাতেমা। 'সিতারা' (১৩৩৬) গল্পে লেখক অভিজাত ক্ষয়িষ্ণু মুসলমানের পতিতাসক্ত ক্লেদময় জীবনকে রূপায়িত করেছেন। নিঃসন্তান খান বাহাদুর এম মতিন অভিজাত ধার্মিক মুসলমান, কিন্তু পতিতা মনুজানের প্রেমাসক্ত। মনুজানের গর্ভে তার সিতারা নামে একটি কন্যার জন্ম হয়। কন্যাটিকে মতিন সাহেব গৃহে নিয়ে আসেন এই বলে যে, তিনি কলকাতায় আরেকটি বিয়ে করেছিলেন, সেই বিবির ঘরের

কন্যা সিতারা। পারিবারিক অশান্তির আশঙ্কায় তিনি এ কথা এতদিন গোপন রেখেছিলেন। সাম্প্রতিক কলেরায় সিতারার মা মারা যাওয়ায় সিতারাকে নিজ গৃহে নিয়ে এসেছেন। গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় তিনি সৈয়দাবাদের জমিদার নন্দন সৈয়দ আশরাফের সঙ্গে সিতারার বিয়ে দেন। সৈয়দ আশরাফও বহুগামী এবং পতিতাসক্ত। সে একদিন মনুজানের ঘরেই গিয়ে হাজির হয় এবং ঘটনাক্রমে জানতে পারে তার স্ত্রী সিতারা পতিতা মনুজানেরই কন্যা। 'বিবর্তন' গল্পেও লেখক উচ্চবিত্ত নিষ্ঠাবান ধার্মিক মুসলমানের যৌন অনাচারকে চিত্রায়িত করেছেন। গল্পে দেখা যায়, উচ্চবিত্ত মুসলমান মৌলানা মোহাম্মদ হোসেনের উদগ্র কামনার শিকার তারই পঙ্গু নুলা গৃহপরিচারিকা লুলী। অনুতপ্ত মৌলানা পরে সন্তানসম্ভবা লুলীকে বিয়ে করে।

আবুল ফজল ক্ষয়িষ্ণু বনেদি মুসলমানের ক্লেদময় জীবনকে যেভাবে রূপায়িত করেছেন তা থেকে লেখকের জীবনভাবনার গভীরতা এবং বহুমুখিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আবুল ফজলের ছোটগল্পে নানা প্রসঙ্গে বলিষ্ঠভাবেই উপস্থিত বিত্তহীন বৈভবহীন নিষ্পেষিত দরিদ্র মানুষের জীবন। তাঁর 'আলোছায়া', 'দুইরাত্রি', 'রহস্যময়ী প্রকৃতি', 'নিজের মা ও পরের বাপ', 'সাক্ষী', 'সিতারা', 'জনক' এবং 'বিবর্তন' গল্পে হতদরিদ্র মানুষের জীবন বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

'আলোছায়া' (১৩৩৬) গল্পে গল্পকার অভুক্ত অনাহারী ভিখিরি জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। 'দুই রাত্রি' (১৩৩৬) গল্পে লেখক চাকর-চাকরানির কষ্ট-ক্লান্ত জীবনকে রূপায়িত করেছেন। গল্পের চাকর কানু, চাকরানি আমিনা এবং আমিনার ভিখারিনি মা দেশের দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় মানবজীবনেরই প্রতিনিধি। 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' (১৩৪৫) গল্পে চিত্রায়িত হয়েছে গরিব চাষি মজিদের ভাগ্যবিড়ম্বিত বেদনাময় জীবন। 'নিজের মা ও পরের বাপ' (১৩৫০) গল্পে তুলে ধরা হয়েছে গরিব এক গৃহপরিচারিকার কথা। সমাজে যাদের কথা সাধারণত কেউ ভাবে না। বিশেষ করে আবুল ফজলের সমকালে এদেশে যাদের প্রসঙ্গে কথা বলা খুব সহজ ছিল না, সেই পতিতাদের জীবনও লেখক তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। 'সাক্ষী' গল্পে লেখক এমন একজন পতিতার কথা ব্যক্ত করেছেন যিনি পতিতা হয়েও মহৎ। 'সিতারা' (১৩৩৬) গল্পে রূপদান করা হয়েছে এক পতিতা ও তার কন্যার বিড়ম্বিত জীবন। 'জনক' (১৩৩৪) গল্পে আছে চরিত্রহীন প্রতারক জমিদারের লালসার শিকার অসহায় দরিদ্র প্রজার জীবনকথা। 'বিবর্তন' গল্পে পাওয়া যায় লম্পট মৌলানার ভোগের শিকার পঙ্গু গৃহপরিচারিকার জীবন চিত্র।

আবুল ফজলের ছোটগল্পে বিচিত্র প্রসঙ্গে চিত্রিত হতদরিদ্র মানুষের জীবন থেকে তাঁর দরদপ্রবণ মানবতাবাদী জীবনভাবনাই প্রকাশিত হয়।

প্রেমবোধ মানুষের চিরায়ত অনুভবের অন্যতম। প্রেম মানুষের সরল সাধারণ স্বাভাবিক জীবনে স্থান-কাল-পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিতের প্রতিকূলতায় সৃষ্টি করে নানা রকম মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও জটিলতা। সকল প্রতিকূলতাকে বরণ করেও প্রেম মানবজীবনের

এক অপার ঐশ্বর্য। আবুল ফজল তাঁর গল্পে একস্থানে লিখেছেন, " প্রেম-ই হচ্ছে দেহ-মনের শাশ্বত ধর্ম — নিষ্প্রেম হওয়ার মানে অমানুষ হওয়া।" (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ১৮০) লেখক বেশকিছু ছোটগল্পে মানুষের এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাপূর্ণ প্রেমময় জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 'তিনবার', 'কবিতার কাঁটা', 'সতীর সহমরণ', 'রাহু', 'বিয়োগান্ত', 'কবিতার অপমৃত্যু' এবং 'প্রেম ও মৃত্যু' গল্পের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

'তিনবার' (১৩৫৩) গল্পে চিত্রিত হয়েছে বর্ণপ্রথা শাসিত অভিজাত উচ্চবর্ণ হিন্দু পরিবারের মেয়ে স্নেহলতা এবং কলেজের লেকচারার ইন্দুবাবুর প্রেমময় জীবন, যারা সমাজের নির্মম পীড়নে ধর্মান্তরিত হতে এবং তিনবার বিয়ে করতে বাধ্য হয় তবুও তাদের প্রেমব্রত থেকে বিচ্যুত হয় না। 'কবিতার কাঁটা' (১৩৩৭) গল্পে বর্ণিত হয়েছে এক লজিং মাস্টার কবির ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি। কবিতা লেখার দোষেই যার প্রেম পণ্ড হয়। 'সতীর সহমরণ' (১৩৪০) গল্পে চিত্রিত হয়েছে দু'টি অসম বয়সী নরনারীর প্রেমময় জীবন, যেখানে বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুতে যুবতী স্ত্রী অন্য এক যুবকের প্রণয় নিবেদনকে অগ্রাহ্য করে স্বেচ্ছায় সহমরণে ধাবিত হয়। 'রাহু' গল্পে তুলে ধরা হয়েছে মাসুদ এবং রাহেলার গভীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাময় পরকীয়া প্রেম। 'বিয়োগান্ত' গল্পে ব্যক্ত হয়েছে এক লেখকের বিয়োগান্তক প্রেমের কাহিনি। বহুগামী পুরুষের নিজ স্ত্রীর প্রতি অনীহা এবং পরনারীর প্রতি আসক্তির বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে 'কবিতার অপমৃত্যু' (১৩৩৯) গল্পটিতে। 'প্রেম ও মৃত্যু' গল্পে বিবৃত হয়েছে আফতাব নামে এক মেধাবী সি.এস.পি পাস যুবকের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কুৎসিৎ চেহারার নার্সের প্রেম কাহিনি। গল্পটিতে লেখক প্রেমকে জীবনের প্রতীক হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেম যেখানে প্রাণবন্ত মৃত্যু সেখানে বাসা বাঁধতে পারে না, অথবা জীবন ততদিনই থাকে যতদিন প্রেম থাকে; এই সত্যই লেখক গল্পটিতে তুলে ধরেছেন।

আবুল ফজল ছোটগল্পে মানুষের প্রেমময় জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন তা থেকে লেখকের বিজ্ঞানমনস্ক বাস্তব শরীরবাদী জীবনভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

আবুল ফজল তাঁর কিছু ছোটগল্পে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুক্তিবাদী মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন আধুনিক মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। যারা চলমান সমাজবাস্তবতা থেকে অগ্রসর, চিন্তা চেতনায় কুসংস্কারমুক্ত, আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি কামনায় উজ্জীবিত। জীবনভাবনার দিক থেকে এই গল্পগুলোর সঙ্গে কল্লোল যুগের ছোটগল্পসমূহের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের সবুজপত্র যুগের গল্পের সঙ্গেও এই গল্পগুলোর সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১০ : ৫৩৩, ৫৬৭, ৫৯৯) তিনটি ছোটগল্পে আবুল ফজল তৎকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন থেকে অগ্রসর অতি আধুনিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্প তিনটি হলো : 'কুমারী এ-মা', 'বিংশ শতাব্দী' এবং 'গল্পের নায়িকা'।

এ-মা নামে এক শিক্ষিত অতিআধুনিক কুমারী নারীর গল্প 'কুমারী এ-মা' (১৩৪১)। লেখক গল্পের প্রথম বাক্যেই লিখেছেন, "যে মেয়েকে নিয়ে এ গল্পের অবতারণা তিনি

হচ্ছেন এম-এ পাস।" (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ১৭৯) এ-মা সিগারেট খায়, মেয়েদের ক্রিকেট টিম গড়ে, বিবাহপ্রথার ঘোর বিরোধী। বিয়ে সম্পর্কে তার অভিমত, "বিয়ের বৃত্ত-রেখার মধ্যে প্রেমকে ধরে রাখার চেষ্টা, সে নেহাৎ অক্ষমেরই বৃত্তি এবং প্রেমের রাজ্যে তার চাইতে অস্বাস্থ্যকর আর কিছুই নেই।" (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ১৮১) পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে তিনি বলেন :

> দেশের কতগুলো লোক নিজেদের অর্থ, অবসর ও বিদ্যার জোরে দেশের প্রতিনিধি সেজে অর্থ ও বিত্তহারা অসহায় নর-নারীর বিরুদ্ধে কিভাবে ষড়যন্ত্র লাগিয়েছে? তাঁদের বড়মানুষী খেয়াল — বেশ্যা ব্যবসাকে দেশ থেকে তুলে দিতে হবে। এঁদের দেখাদেখি যাঁরা বিয়ে করেছেন ও যাঁদের বিয়ে করার সংস্থান আছে, সবাই এক সঙ্গে তাল ঠুক্‌তে লেগে গেছেন। এঁরা নিজেরা বিয়ে করেছেন বা বিয়ে করার সম্বল এঁদের আছে, এই মোহে যারা বিয়ের বাজার থেকে বিতাড়িত বা বিয়ে করার আদৌ সংস্থান যাদের নেই, তাদের দেহেও যে রক্ত মাংস আছে, এ কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ১৮৭)

গল্পে এই আধুনিক উচ্চশিক্ষিত এ-মা নিজেই এক উড়্-বি ব্যারিস্টারের খপ্পরে পড়ে অবৈধ মাতৃত্বের দায়বদ্ধতায় জড়িয়ে যায়। গল্পটিতে গল্পকার অতিআধুনিক বাঙালি নারীর অন্তর্গত অসংগতিকে চিহ্নিত করেছেন। গল্পটির মধ্যে লেখকের মানবতান্ত্রিক জীবনভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিংশ শতাব্দী' (১৩৩৭) গল্পে লেখক আধুনিক বস্তুবাদী নাস্তিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী আধুনিক জীবনের গল্প 'গল্পের নমুনা' (১৩৩৮)। উত্তম পুরুষে লেখা এ গল্পের কথক জানাচ্ছেন :

> ...মানুষের দীর্ঘদিনের পরীক্ষার ফলে জানা গেছে; দেহ ছাড়িয়ে কোন সত্যিকার প্রেম হয় না — প্রেমের হাওয়াকে কেন্দ্র করে হতে পারে কল্পনার জাপানী ফানুস, যা এতদিন ধরে হয়েও এসেছে। এতদিন ধরে বোকা মানুষ এই ফানুসকে মনে করে এসেছে সত্যিকার প্রেম এবং তাকে আকাশে উড়িয়ে বাহবা দিয়ে মনকে দিয়েছে ফাঁকি। যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের মুক্তবুদ্ধি মানুষ আজ বুঝেছে : এতদিন শুধু মরীচিকার পেছনেই হাপিত্যেস করে ঘোরা গেছে, তাই এক ফুঁয়ে সে ফানুস দিলে নিবিয়ে; — এই আলেয়ার আলো যখন সরে গেল তখন দেখা গেল, মানুষের দেহেই বিরাজ করছে প্রেমের পুষ্পোদ্যান। সে প্রেম পাওয়াতে যেমন দেহমনের নিবিড় পরিতৃপ্তি — সে প্রেম না পাওয়াতেও তেমনি নিবিড় বেদনা, যে বেদনা মানুষের বুকে সৃষ্টি করে তার sweetest songs! (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ৩০৬)

গল্পটিতে লেখকের সংস্কারমুক্ত যুক্তিনিষ্ঠ মানবতান্ত্রিক শরীরবাদী জীবনভাবনা অতি স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে।

মানবসমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ রাজনীতি। একটি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তথা সার্বিক অবকাঠামো নির্মাণে অনেকাংশেই নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে থাকে সে দেশের রাজনীতি। অপরাজনীতির অনৈতিক অভিঘাত সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। এই বিপন্নতাবোধ মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী অন্যায় যুদ্ধ, নিয়মবহির্ভূত ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড

সাধারণ নাগরিক জীবনের বিপন্নতাবোধকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়, রাষ্ট্রীয় জীবনের ন্যায়-শূন্যতা নাগরিকের ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তাবোধকেও তিরোহিত করে; তৈরি হয় নানা রকম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও সংকট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর এই সংকট সারা পৃথিবীকেই গ্রাস করেছিল। বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক সংকটসহ বাংলাদেশের নিকট অতীতের নীতিহীন নির্মম রাজনীতির রূঢ় বাস্তবতা আবুল ফজল অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বাঙালির মনে যে বিপন্নতা সৃষ্টি করে আবুল ফজলের কিছু ছোটগল্পে তা অবিনশ্বর হয়ে আছে। তাঁর রচিত এই গল্পগুলো হলো : 'মৃতের আত্মহত্যা', 'নিহত ঘুম', 'ইতিহাসের কণ্ঠস্বর' এবং 'কান্না'।

'মৃতের আত্মহত্যা' (১৯৭৭) গল্পে লেখক ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত একজন আর্মি অফিসারের স্ত্রীর অন্তর্দহন ও বিপন্নতার মধ্য দিয়ে আবুল ফজল অসাধারণ দক্ষতায় জাতির বিপন্নতাকে রূপায়িত করেছেন। গল্পে দেখা যায়, খুনি আর্মি অফিসারের স্ত্রী সোহেলি ১৫ আগস্টের অন্যায় হত্যাকাণ্ডের পাপবোধে এতটাই বিপন্ন হয়ে পড়ে যে, সে নিজেকে আর জীবিত ভাবতে পারে না। নিজের কাছে নিজেকে তার মনে হয় এক মৃত মানব। স্বামী য়ূনুস যখন তাকে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুম্বনে সিক্ত করে তোলে তখন তার মনে হয় : "এ যেন এক মৃত দেহকে জড়িয়ে ধরে, মৃতের মুখে চুমো খাওয়া।" (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ৩৫২) খুনি স্বামীর স্পর্শ তার কাছে অসহ্য এবং অপবিত্র মনে হয়। সোহেলির এই মনস্তাত্ত্বিক সংকট ও পরিবর্তনের কথা সে তার বান্ধবী আফরোজাকে জানাচ্ছে :

> জানো, একদিন চুমো নিয়েও আমি কবিতা লিখেছিলাম। এমনকি রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন। প্রিয়জনের চুম্বনের সেই অনির্বচনীয় পুলক, সর্বদেহে যা একদিন রোমাঞ্চের সৃষ্টি করতো তা আজ কোথায় হারিয়ে গেল। কি এক অসম্ভব পরিবর্তন, এখন ওর স্পর্শে আমার সারা শরীর রি রি করে ওঠে। বাথরুমে গিয়ে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে নেওয়ার পর মনে হলো আমি আবার পাক-সাফ হলাম। (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ৩৫২)।

সারাক্ষণ সে গভীর আত্মপীড়নের মধ্যে থাকে। তার নিজেকে মনে হয় খুনির বৌ, সন্তানকে মনে হয় খুনির সন্তান। রাতের বেলা তার অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হয়ে ওঠে। তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গল্পকার লিখেছেন : "রাতের অবস্থা সবচেয়ে অসহ্য হয়। য়ূনুসের স্পর্শে সোহেলির সর্ব শরীর কুঁকড়ে যায়। কোনো সাড়াই যেন থাকে না দেহে। তবুও মরার মতো পড়ে থেকে সয়ে যেতে হয় সব অত্যাচার।" (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ৩৫৩) আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বিপন্ন সোহেলি অবশেষে আত্মহত্যার মধ্যেই মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

'নিহত ঘুম' (১৯৭৭) গল্পে লেখক আগস্ট হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী এক সৈনিকের আত্মগ্লানি রূপায়ণের মাধ্যমে রাজনৈতিক অভিঘাতের বিপন্নতাকে তুলে ধরেছেন। সে সৈনিক পাপবোধে এতটাই অস্থির হয়ে ওঠে যে সারা জীবনের জন্য তার সকল শান্তির অবসান ঘটে, সে আর ঘুমোতে পারে না। আত্মদহনে দগ্ধ অনুতপ্ত সৈনিক বলছে :

> এখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছি আমিই আমার ঘুমের হন্তা। খুন করেছি নিজের চোখের ঘুমকে নিজের হাতে। অশরীরী ঘুমকেও যে একভাবে হত্যা করা যায় তা আমার জানা ছিল না আগে। একটা বৃহৎ জ্ঞান যেন আমার চোখের সামনে উন্মোচিত হলো – হত্যা শুধু নিহতকে হত্যা করে না, হত্যাকারীকেও করে। অন্য কিছু বোধ হয় এভাবে বুমেরাং হয় না। (আবুল ফজল, ১৯৯৫ : ৩৫৯)

'ইতিহাসের কণ্ঠস্বর' (১৯৭৭) গল্পে লেখক অতিপ্রাকৃত পরিবেষ্টনী তৈরির মধ্য দিয়ে নিহতদের স্বজনদের বেদনা ও বিপন্নতাকে রূপায়িত করেছেন। 'কান্না' (১৯৭৭) গল্পে গল্পকার শিশু রাসেলের হত্যাকাহিনির মধ্য দিয়ে আরেক শিশু-জীবনের বিপন্নতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবুল ফজল কিছু গল্পে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর জীবন-সংকটকে তুলে ধরেছেন। কিছু গল্পে আছে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের আভাস। এ প্রসঙ্গে 'পরিণাম', 'উচ্চ ও তুচ্ছ', 'তিনবার', 'বিবর্তন' এবং 'বিংশ শতাব্দী' গল্পের নাম উল্লেখ করা যায়।

এ পর্যায়ের গল্পগুলো থেকে আবুল ফজলের রাজনীতি ও সমকালসচেতন জীবনভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

৬

আবুল ফজল কলাকৈবল্যবাদে আস্থাবান ছিলেন না, প্রগাঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন সাহিত্যের জীবনবাদিতায়। সাহিত্যে তিনি রূপায়িত করতে চেয়েছেন সুস্থ-সবল-পরিপূর্ণ মানুষ। তাঁর ভাষায়, "... আমি তো স্বপ্ন দেখেছি অখণ্ড জীবনের, আস্ত মানুষের, গোটা মানুষের। খণ্ডিত, বিকৃত ও রোগ-পাণ্ডুর জীবনের স্বপ্ন আমার নয়। জীবন-সাধক সুস্থ মানুষকে সাহিত্যে দাঁড় করাবার স্বপ্ন রচনাই ছিল আমার ব্যসন।" (আবুল ফজল, ২০০৫ : ৪৫) জীবনবাদী আবুল ফজল শিল্পের জন্য শিল্প নয়, তিনি শিল্প নির্মাণে অগ্রসর হয়েছিলেন জীবনকে বিকশিত করে তোলার প্রত্যয়ে। যে প্রত্যয়ের মৌল উৎস মানবতন্ত্র। তিনি মনে করেন, "এখন পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষ শিল্পীর মনের এত কাছাকাছি এসে পড়েছে যে, যে-কোন সৎ শিল্পী আজ মানবতন্ত্রী না হয়েই পারে না। ফলে যুগ-সচেতনতা বা যুগ-জিজ্ঞাসা তাঁর পক্ষে আজ অপরিহার্য।" (আবুল ফজল, ২০০৫ : ১৮) তাঁর গল্পে প্রতিফলিত জীবনভাবনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কালসচেতন শিল্পীর পারিপার্শ্বিক সমাজ পরিবর্তনপ্রয়াসের দায়বদ্ধতা, যে দায়বদ্ধতার পেছনে সক্রিয় রয়েছে মুসলিম সাহিত্য সমাজের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের আদর্শ এবং দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি আর ভালোবাসা। এ কথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় যে, আবুল ফজলের সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতি সচেতন যুক্তিবাদী, উদার, কুসংস্কারমুক্ত এবং পরিবর্তনকামী মানবতাবাদী জীবনভাবনাই তাঁর ছোটগল্পে বিধৃত হয়েছে; পারিপার্শ্বিক সামাজ পরিমণ্ডল এবং বস্তুবিশ্ব থেকে যে জীবনভাবনাকে তিনি তাঁর সত্তায় ধারণ করেছেন স্থির প্রত্যয়ে। কারণ "... it is not being that is determined by thinking, but thinking that is determined by being." (Plekhanov, 1977 : 55)

গ্রন্থপঞ্জি

আনোয়ার পাশা রচনাবলী প্রথম খণ্ড (১৯৮১)। সম্পা : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (২০০২)। *সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে*, গ্লোব লাইব্রেরি, ঢাকা।

আবুল ফজল (২০০৬) । *রেখাচিত্র*, গতিধারা, ঢাকা।

আবুল ফজল রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৯৫)। সম্পা : আলাউদ্দিন আল আজাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবুল ফজল (২০০৫)। *সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র*, গতিধারা, ঢাকা।

আবুল ফজল (১৯৮১)। *নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

এম এম আকাশ (১৯৯০)। *ভাষা-আন্দোলন : শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ*, ইউ পি এল, ঢাকা।

ভূদেব চৌধুরী (১৯৮৯)। *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১০)। *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

রাখালচন্দ্র নাথ (১৯৮৮)। *উনিশ শতক : ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়*, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯০)। *ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি*, ইউ পি এল, ঢাকা।

Plekhanov (1977). *Fundamental Problems of Marxism*, Progress Publishers, Moscow.